আর্থিক খাত ও ব্যাংক ব্যবস্থা

ইউনিট ৫

পাঠ - ১ : মূলধন বাজার ও মুদ্রাবাজারের উপাদান শেয়ার বাজার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- শেয়ার বাজার কি তা বলতে পারবেন।
- দেশের অর্থায়নে এটি কি ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে একটি আলোচনা করতে পারবেন।

শেয়ার বাজার বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাবলীর একটি। আমরা টেলিভিশন খবরে বা সংবাদপত্রে শেয়ার সূচকের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটেছে দেখতে পাই। আমরা কি কখনও ভেবেছি শেয়ার বাজার কি? কেনইবা এর সূচকের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে?

সংজ্ঞা

স্বচ্ছ আয়নায় যেমন লোকের চেহারা দেখা যায় তেমনি শেয়ার বাজারের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যায় তাহলে এখন প্রশ্ন উঠে শেয়ার বাজার কি? "শেয়ার বাজার হল যে বাজারে কোন কোম্পানির শেয়ার ও ইকুইটি ক্রয়-বিক্রয় হয়।"

কোন কোম্পানি মূলধন বাড়ানোর জন্য বাজারে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ বিক্রি করে দিয়ে টাকা বা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। এই যে টাকা সংগ্রহ করার উপায় এটা হল শেয়ার বাজার। তাই শিল্পের মূলধন সংগ্রহের জন্য কোম্পানি তার অংশ বিক্রি করার জন্য বাজারে আসে। তাই একটা দেশের শেয়ার বাজার যত বড় সে দেশের উৎপাদন কর্মকান্ড তত বড়। আর যে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যত ছোট সে দেশের শেয়ার বাজার তত ছোট। একটি দেশের উৎপাদন যত বাড়বে সে দেশের শেয়ার তত দ্রুত বাড়বে। তাই শেয়ার বাজারকে বলা যেতে পারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রাণ।

শেয়ার বাজারে মূল্যস্তর বাড়া বা কমা চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশী থাকে তবে মূল্যস্তর বাড়বে। অর্থাৎ সূচকের বৃদ্ধি ঘটবে। আর যদি যোগান চাহিদার তুলনায় বেশী হয় তবে সঙ্গত কারণেই দাম কমবে। কিন্তু শেয়ারের চাহিদা বাড়াটা নির্ভর করে সেই প্রতিষ্ঠানের অধিক মুনাফা অর্জন, অধিক হারে মুনাফা বিতরণ, নতুন করে রাইট শেয়ার ও বোনাস শেয়ার বিতরণ করা। শেয়ার এর এই দাম বৃদ্ধির প্রবণতাকে বলা হয় তেজী ভাব বা Bullish। আর শেয়াররের চাহিদা কমে যাবে যদি ঐ কোম্পানির দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি ধরা পড়ে এবং তা প্রকাশিত হয়। শেয়ারের দুটি বাজার আছে একটি হল মূল শেয়ার বাজার আর অন্যটি হল কার্ব (Curb) মার্কেট। মূল শেয়ার বাজার কতগুলো নিয়ম-কানুন মেনে

চলে শেয়ারের কেনা-বেচা হয়। আর কার্ব মার্কেটে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট ব্যক্তিগত পর্যায়ে শেয়ার বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করে। তবে মূল বাজারের তুলনায় কার্ব মার্কেটে শেয়ারের দাম কম বা বেশী হয়। তেজী ভাবের সময় কার্ব মার্কেটের শেয়ারের মূল্য মূল শেয়ার বাজার থেকে বেশী হয়। আর মন্দাভাবের সময় মূল বাজারের তুলনায় কার্ব মার্কেটে শেয়ার মূল্য কম থাকে। প্রতিটি শেয়ারের বাজারে শেয়ারের একবার করে বিনিময় হয় তবে বিশেষ কারণে শেয়ারের বিনিময় বন্ধ থাকতে পারে। যেসব শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে কম উঠানামা করে সেই সব শেয়ারকে বলা হয় blue chip শেয়ার।

অনুশীলন :

কয়েকটি blue chip শেয়ারের নাম বলুন ও লিখুন।

তুলনামূলকভাবে যারা কম ঝুঁকি নিতে চায় তারা নষঁব পযরঢ় শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারে।

বাংলাদেশের শেয়ার বাজার তুলনামূলকভাবে নতুন ও ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা অত্যন্ত কম। যার সংখ্যা ২০০ এর কাছাকাছি। বাংলাদেশে দুটি শেয়ার বাজার আছে। একটি হল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ আর অন্যটি হল চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। ১৯৯৫ সালে ১০ অক্টোবর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ চালু হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ২০০ এর মত সদস্য আছে। যার অর্ধেকেরও বেশী অকার্যকর। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য হতে ১ কোটি টাকা দরকার হয়। তাই নতুন সদস্য এই বাজারে অংশ নিতে পারে না। তাই সরকারের উচিত নতুন কিছু সদস্য সংগ্রহ করা। যার ফলে সদস্যের সংখ্যা বাড়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় ব্যবস্থা চালু হয়।

বাংলাদেশের শেয়ার বাজারের আয়তন ছোট ও বড় সদস্যের সংখ্যা কম বলে Manipulate করে মূল্য বাড়ানো হয়। এর ফলে কখনো হঠাৎ করে মূল্যে বাড়ে কোন কারণ ছাড়াই। অথচ ঐ শেয়ারের মূল্য বাড়ার কথা নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে এক্সিলজ সু কোম্পানি দুই সদস্যের সাথে যোগ করে মূল্য বাড়ায়। পারে এটা ধরা পড়ার পর সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দুই সদস্যের বিরদ্ধে জরিমানা করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সদস্য পদ বাতিল করে। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন হল শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান।

আমরা নতুন সদস্য গ্রহণের নিয়মকানুন যুগোপযোগী করা, আধুনিকায়ন করা প্রভৃতির মাধ্যমে স্টক বাজারকে আরও বেশী গতিশীল ও স্থিতি অবস্থায় নিয়ে আসতে পারি।

পাঠ - ২ : স্বর্ণের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- স্বর্ণমান কি তা বলতে পারবেন।
- স্বর্ণমানের সুবিধাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বর্ণমানের অসুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্বর্ণ কার কাছে মূল্যবান নয়। স্বর্ণ কাঙ্ক্ষিত নয় – এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু কখনও চিন্তা করেছেন কি, স্বর্ণ কেন এত মূল্যবান! অথচ লৌহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজে আসে। আবার, স্বর্ণ দিয়ে তৈরী জিনিসের চাইতে লৌহনির্মিত জিনিস বেশি মজবুত। তারপরও স্বর্ণ কেন সকলের কাছে কাঙ্ক্ষিত? স্বর্ণের এই মূল্যের কারণ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে স্বর্ণমান কি।

স্বর্ণমান :

যখন কোন দেশে প্রামাণিক মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত করা হয় অথবা মুদ্রা যদি এরূপ হয় যার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা দপ্তর হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায় তখন সে মুদ্রা-ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান বলা হয়। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও অর্থের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, সম্পর্কটি কি?

এর উত্তরে বলা যায়, মুদ্রার আর্থিক মূল্য এর স্বর্ণমূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং স্বর্ণের মূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে আর্থিক মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে।

স্বর্ণের সাথে অর্থের সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বর্ণমানকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

১. পূর্ণ স্বর্ণমান
২. স্বর্ণপিন্ডমান
৩. স্বর্ণ বিনিময় মান
৪. স্বর্ণ সমতামান

নিম্নে একটি আলোচনা তুলে ধরা হল।

১. পূর্ণ স্বর্ণমান : এটি এমন একটি মুদ্রাব্যবস্থা যাতে দেশের প্রামাণিক মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণ দিয়ে তৈরি হয় এবং মুদ্রার আর্থিক মূল্য এর ধাতব মূল্যের সমান থাকে। এ ছাড়া, বাজারে প্রচলিত কাগজী নোট ও অন্যান্য সকল প্রকার মুদ্রা নির্ধারিত হারে স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তিত করা চলে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের জন্য স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা তৈরি করে দিতে সর্বদা আইনত প্রস্তুত থাকেন। ১৯১৪ সালের আগে ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং আরও কয়েকটি দেশে এরূপ মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

২. স্বর্ণপিন্ডমান : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন উঠে যায় এবং তার পরিবর্তে যে নতুন ধরনের স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে স্বর্ণপিন্ডমান বলা হয়। এ ব্যবস্থায় স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত কোন মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকে না। তবে কাগজী মুদ্রা বা অন্য কোন যে সকল মুদ্রা বাজারে চালু থাকে তা একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণপিন্ডে পরিবর্তিত করা চলে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রয়োজনে দেশের মুদ্রাকর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ক্রয় ও বিক্রয় করতে বাধ্য থাকেন। এ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল স্বর্ণের ব্যবহারের মিতব্যয়িতা আনয়ন

করা। ইংল্যান্ডে ১৯২৫ সাল হতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এবং ভারতবর্ষে ১৯২৭ সাল হতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল।

৩. স্বর্ণ বিনিময় মান : এই ব্যবস্থায়ও বাজারে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না। অভ্যন্ত রীণ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কাগজী মুদ্রা ও অন্যান্য মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। মুদ্রা কর্তৃপক্ষ কাগজী বা অন্য মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত থাকেন না। তবে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্য মুদ্রা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট হারে অন্যান্য দেশে স্বর্ণভিত্তিক মূল্য পাওয়া যায়। ১৮৯৮ সাল হতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

৪. স্বর্ণ সমতামান : এই ব্যবস্থায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণের ব্যবহার করা হয় না। তবে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ কিছু পরিমাণ স্বর্ণ মজুদ রেখে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারের স্থায়িত্ব বিধান করেন। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলযুক্ত দেশগুলির মধ্যে এই ধরনের একটি স্বর্ণমান প্রচলিত আছে।

অনুশীলন :
স্বর্ণের অর্থের সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বর্ণমানের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
এখন স্বর্ণমানের গুরুত্ব জানার জন্য আসুন আমরা এর সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করি।

স্বর্ণমানের সুবিধা

১. আন্তর্জাতিক মুদ্রা : স্বর্ণমানের প্রথম সুবিধা হল – এর ফলে দেশের প্রচলিত মুদ্রা পৃথিবীর সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হয়। স্বর্ণই হল একমাত্র বিনিময় মাধ্যম যা সকল দেশে অবাধে এবং আগ্রহ সহকারে গৃহীত হয়। এই মুদ্রার সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন দেশে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। সুতরাং, এটি একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব : পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে তাহলে সকল দেশে একই মুদ্রামান প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর ফলে বৈদেশিক বিনিময় সহজ হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক বেশি সহজে এবং অবাধে চলতে পারে।

৩. লেনদেনের ভারসাম্য সমতা : যদি কোন কারণে একটি দেশের বৈদেশিক দেনা বৈদেশিক পাওনা অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে দেশ হতে স্বর্ণ রপ্তানি হবে। এর ফলে দেশের মুদ্রার পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে মূল্যস্তরও কমে যাবে। মূল্যস্তর কমে গেলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানি কমে যাবে। এভাবে একদিকে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং অপরদিকে আমদানি হ্রাসের ফলে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা দূর হবে।

৪. বিনিময় হার স্থির থাকে : এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক দেশের মুদ্রার মূল্য এর স্বর্ণমূল্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের স্বর্ণমুদ্রার অনুপাতে বৈদেশিক বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়। এজন্য স্বর্ণমান প্রবর্তনকারী দেশগুলির বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্থির থাকে।

৫. মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা : স্বর্ণের মোট যোগান মোটামুটি স্থির থাকে বলে মুদ্রার পরিমাণ স্থির থাকে। ফলে মূল্যস্তর ও স্থির থাকে। দেশের মুদ্রাব্যবস্থা স্বর্ণের সাথে সংযুক্ত থাকে বলে ইচ্ছামত অতিরিক্ত পরিমাণে মুদ্রার প্রচলন করা চলে না। এজন্য মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে না।

স্বর্ণমানের অসুবিধা

১. স্বর্ণমান স্বয়ংক্রিয় নয় : স্বর্ণমান ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়তা প্রধান দুইটি শর্তের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, স্বর্ণের অবাধ আমদানি ও রপ্তানির উপর। দ্বিতীয়ত, মূল্যস্তরের উপর এর পূর্ণ প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্যের উপর। এই সকল নিয়মকে 'স্বর্ণমান ক্রীড়ার নিয়মাবলী' বলা হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোন দেশই এই সকল নিয়ম পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে না। যেমন – স্বর্ণ রপ্তানি হতে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি সাধারণতঃ ব্যাংক হার বাড়িয়ে স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করতে চেষ্টা করে। আবার স্বর্ণের আমদানি হতে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বর্ধিত স্বর্ণের ভিত্তিতে অর্থের পরিমাণ না বাড়িয়ে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়ে থাকে। এ সকল কারণে স্বর্ণমানকে স্বয়ংক্রিয় না বলে 'পরিচালিত মান' হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে।

২. আর্থিক স্বাধীনতা খর্ব হয় : স্বর্ণমানের আর একটি প্রধান অসুবিধা হল যে, এতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন স্বাধীন নীতি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার খাতিরে দেশের আভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে, অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব অপেক্ষা বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থায়িত্বের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এমনকি, বৈদেশিক বিনিয়োগের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য অনেক সময় দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। যেমন – বিনিময় হার প্রতিকূল হলে স্বর্ণমানের নিয়ম অনুযায়ী মুদ্রাসংকোচন করতে হয়। মুদ্রাসংকোচনের ফলে উৎপাদন, জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিমাণ কমে যায়।

৩. মুদ্রাসংকোচন ও বেকারত্ব : অর্থনীতিবিদ কেইন্‌স-এর মতে স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসংকোচন ও বেকারত্বের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। যে সকল দেশের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হবে সে সমস্ত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকের হার বাড়িয়ে স্বর্ণ রপ্তানি বন্ধ করার চেষ্টা করবে। ব্যাংক হার বাড়িয়ে দিলে বিনিয়োগ কমে যায় এবং বেকার সমস্যা দেখা দেয়। ফলে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিবে।

৪. আন্তর্জাতিক অরাজকতা : স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে কোন দেশে মুদ্রা ব্যবস্থাকে বিদেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সাথে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়। এর ফলে পৃথিবীর কোন দেশে যদি কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় তবে এর ফলাফল স্বরূপ স্বর্ণমানের আওতাধীন অন্যান্য সকল দেশকেই এর অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

৫. মূল্যস্তর স্থির থাকে না : স্বর্ণমান ব্যবস্থা বাস্তবক্ষেত্রে কখনই কোন দেশের মূল্যস্তর স্থির রাখতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্যালিফোর্নিয়ার নতুন স্বর্ণখনি আবিস্কারের ফলে স্বর্ণের উৎপাদন অনেক পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে মূল্যস্তরও অনেকটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষভাগে স্বর্ণের যোগান কমে যাওয়ার ফলে মূল্যস্তর কমে যায়।

৬. মূল্যবান ধাতুর অপচয় : পরিশেষে, কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুব ব্যয়বহুল। যেক্ষেত্রে কাগজী অর্থের দ্বারা বিনিময়ের কাজ চালানো মোটেই অসুবিধাজনক নয়, যেক্ষেত্রে স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান ধাতু মুদ্রা ব্যবস্থার মান হিসেবে ব্যবহার করা অপচয় মাত্র।
আর এ ধরনের নানা অসুবিধার জন্য বর্তমানে স্বর্ণমানের প্রচলন নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অনেক দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করে। যুদ্ধ শেষ হবার পর বিভিন্ন দেশ পুনরায় স্বর্ণমানে ফিরে আসতে থাকে। ১৯২৯ সালের মধ্যে প্রায় সকল দেশই পুণরায় স্বর্ণমান প্রবর্তন করে। কিন্তু এই নতুন 'স্বর্ণযুগ' অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। ১৯৩১ সালে পুণরায় বিভিন্ন দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৩৩ সালে আমেরিকা স্বর্ণমান ত্যাগ করার সাথে সাথে স্বর্ণমানের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

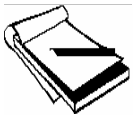

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্বর্ণমান কি? স্বর্ণমান কত প্রকার ও কি কি? আলোচনা করুন।
২. স্বর্ণমানের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. স্বর্ণমানের অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. অর্থের সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বর্ণমানকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
   ক. ৩ ভাগে খ. ৪ ভাগে
   গ. ৫ ভাগে ঘ. ৬ ভাগে

২. কোন মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকে?
   ক. পূর্ণ স্বর্ণমান খ. স্বর্ণ পিন্ডমান
   গ. স্বর্ণ বিনিময় মান ঘ. স্বর্ণ সমতামান

৩. ভারতবর্ষে ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কোন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু ছিল?
   ক. পূর্ণ স্বর্ণমান খ. স্বর্ণ পিন্ডমান
   গ. স্বর্ণ বিনিময় মান ঘ. স্বর্ণ সমতামান

৪. স্বর্ণ হল একমাত্র বিনিময় মাধ্যম যা পৃথিবীর
   ক. সর্বত্র গৃহীত হয় খ. কোথাও গৃহীত হয় না
   গ. অধিকাংশ জায়গায় গৃহীত হয় ঘ. অধিকাংশ জায়গায় গৃহীত হয় না

৫. পৃথিবী থেকে স্বর্ণমানের পুরোপুরি অবসান কত সালে ঘটে?
   ক. ১৯২৭ সালে খ. ১৯২৯ সালে
   গ. ১৯৩১ সালে ঘ. ১৯৩৩ সালে

সমস্যা

ধরুন বাংলাদেশ সরকার কাগজী নোটের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা চালু করল। এক্ষেত্রে অর্থনীতিতে কিরূপ প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

পাঠ - ৩ : ঋণের উৎস — প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ঋণ কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- ঋণের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- কোন্ অবস্থায় কোন্ ধরনের ঋণ নেয়া সুবিধাজনক তা নির্ণয় করতে পারবেন

ব্যবসা বিনিয়োগ :

ধরুন, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে আপনার হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আপনার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। অথবা কোন কিছু কিনতে আপনার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। তখন আপনি কি করবেন? এক্ষেত্রে আপনি বিশেষ কিছু বন্ধক রেখে টাকা ধার নিতে পারেন বা বিশেষ কিছু শর্তের বিনিময়ে টাকা বাকী রেখে জিনিস নিতে পারেন।

এ ব্যবস্থাকেই ঋণ বলে। অর্থাৎ এক কথায়,

১. **গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতে :** যে অর্থ গ্রহণের সাথে ফেরৎ দেয়ার শর্ত জড়িত থাকে তাকে ঋণ বলে।

২. **প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গিতে :** ভবিষ্যতে ফেরত পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অর্থের বর্তমান মালিকানা পরিত্যাগ করাকেই ঋণ বলে।

একে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি –

দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সাথে সাথে তার মূল্য পরিশোধ না করে কিংবা নগদ অর্থ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ তা ফেরত না দিয়ে ভবিষ্যতে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরিশোধ করার অঙ্গীকারকে ঋণ বলে।

অধ্যাপক গাইডের মতে – "আদান-প্রদানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকলে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হয়।"

মূলতঃ তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঋণ সৃষ্টি হয়।

যথা – ১. বিশ্বাস
২. সামর্থ্য
৩. সময়ের ব্যবধান

ঋণগ্রহীতা বিশ্বাসী ও সৎ না হলে তার সাথে ঋণের কারবার চলতে পারে না ; কারণ সেক্ষেত্রে ঋণ প্রত্যার্পনের সম্ভাবনা কমে যায়। আর ঋণ নেয়া ও ফেরত দেওয়ার মধ্যে সবসময়ই সময়ের ব্যবধান থাকে। ভবিষ্যতে কখন ঋণ পরিশোধ করা হবে সে সম্পর্কে ঋণদাতাকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।

অনুশীলনী :

কি কি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঋণ সৃষ্টি হয় এবং কেন?

ঋণের প্রকারভেদ :

ব্যবহার ও সময়ের প্রেক্ষিতে ঋণকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। কি কারণে ঋণ ব্যবহার করা হয় এবং কত সময় ধরে তা ব্যবহৃত হয় এ বিষয়গুলির প্রেক্ষিতেই ঋণের এ শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

ক. প্রথমতঃ, ব্যবহারের ভিত্তিতে ঋণকে তিনভাগে ভাগ করা হয় ; যথা – বাণিজ্যিক ঋণ, ভোক্তার ঋণ ও উৎপাদকের ঋণ।

বাণিজ্যিক ঋণ
বাণিজ্যিক বা গ্রামীন ব্যাংক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীদেরকে যে ঋণ প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ঋণ বলে।

ভোক্তার ঋণ
টেলিভিশন, মটরগাড়ী, ফ্রিজ ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ভোক্তাদেরকে যে ঋণ দেওয়া হয় তাকে ভোক্তার ঋণ বলে। কিস্তিতে জিনিস বিক্রি করে এমন প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক এ ধরনের ঋণ দেয়।

উৎপাদকের ঋণ
কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারীদেরকে যে ঋণ দেয় তাকে উৎপাদকের ঋণ বলে।

খ. দ্বিতীয়তঃ, সময়ের ভিত্তিতে ঋণকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা – স্বল্পমেয়াদী ঋণ, মধ্যম মেয়াদী ঋণ ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।

স্বল্প মেয়াদী ঋণ
যে ঋণ অত্যন্ত অল্প সময় যেমন, কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের জন্য প্রদান করা হয় তাকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ বলে।

মধ্যম মেয়াদী ঋণ
যে ঋণ নাতি-দীর্ঘ সময় যেমন, কয়েক মাস কিংবা এক-দুই বছরের জন্য দেওয়া হয় তাকে মধ্যম মেয়াদী ঋণ বলে। কৃষিঋণ ও ক্ষুদ্রশিল্প ঋণ মধ্যম মেয়াদী ঋণের পর্যায়ভুক্ত।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ
যে ঋণ দীর্ঘমেয়াদ যেমন, কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বলে। কৃষিক্ষেত্রে স্থায়ী উন্নতি বিধান, গৃহ নির্মাণ, বৃহৎ শিল্প-কারখানা স্থাপন ইত্যাদির জন্য গৃহীত ঋণ হল দীর্ঘমেয়াদী।

অনুশীলনী :
ব্যবহার ও সময়ের প্রেক্ষিতে ঋণের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

ঋণ গ্রহীতারা বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এই উৎসগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

ক. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস
খ. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস

ক. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস
সাধারণতঃ একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। বৃহৎ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি এ ধরনের উৎস। যেমন –

১. বাংলাদেশ ব্যাংক : প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যতম। এটি সরাসরি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ দিয়ে থাকে। যে সমস্ত ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এরূপ ঋণ দেয়, বাংলাদেশ ব্যাংক সে সমস্ত সংস্থাকে প্রচলিত ব্যাংক হার অপেক্ষা কম হারে সুদে ঋণ প্রদান করে এবং পরোক্ষভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। যেমন – বাংলাদেশ

ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংক হার অপেক্ষা ২% কম সুদে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং সমবায় ব্যাংককে ঋণ প্রদান করে থাকে। এই উদ্দেশ্য বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি কৃষি বিভাগ নামে একটি বিভাগ চালু করেছে। এটি কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধানে নিয়োজিত।

২. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক : প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সবচেয়ে বেশি কৃষি ঋণ প্রদান করে থাকে। সাধারণত কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচের জন্য গভীর, অগভীর নলকূপ, পাম্পিং মেশিন, হালের গরু ক্রয়, সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিপণ্যের বিপণন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করে থাকে।

৩. রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ : বর্তমানে, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শিল্পোন্নয়নে এক ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলছে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিভিন্ন পর্যায়ে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এ ধরনের ব্যাংকসমূহ দেশের অর্থনীতিতে এক ব্যাপক অবদান রাখছে।

৪. ভূমি বন্ধকী ব্যাংক : এ ধরনের ব্যাংক গ্রাহকদের জমি বন্ধক রেখে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করে।

৫. গৃহনির্মাণ অর্থায়ন কর্পোরেশন : এ প্রতিষ্ঠান গৃহনির্মাণে ঋণদান করে থাকে। সাধারণতঃ বাড়ি নির্মাণে এককালীন অনেক টাকা খরচ হয়। গ্রাহকদের দ্বারা সবসময় একসাথে এত অর্থের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে।

৬. ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান : সাধারণতঃ এন.জি.ও সমূহ ও অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ এ প্রকারভেদে পড়ে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান লাজজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকে। এছাড়া অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজেও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

অনুশীলনী :
কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ করে?

খ. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস

উন্নয়নশীল দেশসমূহে সাধারণতঃ এ ধরনের উৎস হতে ঋণ নেয়া হয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ঋণপ্রাপ্তির কঠিন শর্তসমূহ ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহিত হয় ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহের দ্বারস্থ হয়।
এভাবেই গড়ে উঠে এমন সব প্রতিষ্ঠান যাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা তৈরি। নিম্নে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

১. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব : অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে এটি একটি বড় উৎস। ঋণ গ্রহীতারা নানা প্রয়োজনে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাদের এ ধরনের ঋণের জন্য সাধারণতঃ কোন জামানত বা সুদ দিতে হয় না, বা হলেও তা নিতান্তই কম।

২. গ্রাম্য মহাজন : বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামের লোকজন এদের থেকেই ঋণ গ্রহণ করে। কৃষিকাজ, পারিবারিক অনুষ্ঠান, বিয়ে-শাদী এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ঋণ শোধের জন্য গ্রামের সাধারণ জনগণ এ ধরনের মহাজনদের শরণাপন্ন হয়। তবে এ ধরনের ঋণ গ্রহীতাদের চড়া হারে সুদ দিতে হয়। এ ধরনের ঋণ উসুলের প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠোর। তাই আপাতঃ অর্থে ঋণগ্রহীতা কিছু টাকা পেলেও এ ধরনের ঋণ সমাজ কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে না।

৩. ভূ-স্বামী ও গ্রামীণ ধনী লোক : গ্রামের ধনী লোক ও ভূ-স্বামীগণ কৃষকদের ঋণ প্রদান করে থাকে। অনেক সময় এ ধরনের ঋণের জন্য মূল্যবান জিনিসপত্র অথবা ফসল বাঁধা রাখতে হয়।

অনুশীলনী :

কেন মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নেয়?

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ নেয়া দরিদ্র ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বেশ দুঃসাধ্য ও জটিল। তাই তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ ধরনের সমস্যা দূর করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে যেন তাদের ঋণপ্রাপ্তির শর্তাবলী সহজবোধ্য ও সরল হয়। তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং সমাজ ও জাতি উন্নয়নের ধারায় আরও অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ঋণ কাকে বলে? ঋণের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
২. ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ উল্লেখ করুন।
৩. ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. কোন্‌টি ঋণ সৃষ্টির ভিত্তি নয়?
   ক. বিশ্বাস — খ. সামর্থ্য
   গ. সময়ের ব্যবধান — ঘ. গ্রহীতার ব্যক্তি মালিকানা

২. কোন্‌টি ব্যবহারের ভিত্তিতে ঋণ নয়?
   ক. বাণিজ্যিক ঋণ — খ. উৎপাদকের ঋণ
   গ. সরকারী ঋণ — ঘ. ভোক্তার ঋণ

৩. কোনটি সময়ের ভিত্তিতে ঋণ নয়?
   ক. স্বল্পমেয়াদী ঋণ — খ. পঞ্চবার্ষিক ঋণ
   গ. মধ্যমমেয়াদী ঋণ — ঘ. দীর্ঘমেয়াদী ঋণ

৪. নিচের কোন্‌টি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস?
   ক. এন.জি.ও — খ. গ্রাম্য মহাজন
   গ. ভূ-স্বামী — ঘ. আত্মীয়-স্বজন

৫. নিম্নের কোন্‌টি অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস?
   ক. গ্রাম্য মহাজন — খ. গৃহনির্মাণ অর্থায়ন কর্পোরেশন
   গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক — ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

সমস্যা

ধারণা করুন, আপনি আপনার গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছেন। সেখানে হঠাৎ লক্ষ করলেন আপনার বেশ কিছু পৈতৃক জমি অনাবাদী পড়ে আছে। এর পাশে একটি পুকুরও আছে, যত্নের অভাবে যেখানে কচুরিপানা জমে আছে। আপনি ঠিক করলেন এগুলো সংস্কার করবেন এবং চাষ শুরু করবেন। কিন্তু এতকিছু করার মত পর্যাপ্ত অর্থ আপনার কাছে নেই। এক্ষেত্রে আপনি কিভাবে অর্থের সংস্থান করবেন তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ - ৪ : ব্যাংক-এর প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ব্যাংক-এর উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কি ধরনের ব্যাংকে আপনি মূলধন সঞ্চয় করতে ইচ্ছুক সে সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছ করতে পারবেন।

ভূমিকা

ব্যাংক-এর প্রকারভেদ সম্বন্ধে জানবার আগে আসুন আমরা জেনে নিই ব্যাংক কি এবং এর উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসই বা কি।

ব্যাংক কি

আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যাংক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্যাংক হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা একদিকে জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে তাদের প্রয়োজনমত ঋণ প্রদান করে। জনসাধারণ তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে রাখার জন্য ব্যাংকে জমা রাখে। ব্যাংক এই গচ্ছিত অর্থ পুণরায় জনসাধারণকে ধার দেয়। এভাবে ব্যাংক এক শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ জমা রাখে এবং অন্য এক শ্রেণীর লোককে ঋণ প্রদান করে।

ব্যাংকের উৎপত্তি

ঠিক কোন সময় হতে ব্যাংক-এর উৎপত্তি হয়েছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে তবে ধারণা করা হয়, ইতালীয় শব্দ 'Banco' হতে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি। ইতালীতে 'Banco' শব্দের অর্থ লম্বা টুল। সেখানে লোম্বাডি নামক স্থানে ইহুদী মহাজনেরা লম্বা টুল বা বেঞ্চের উপর বসে টাকা-পয়সা লেনদেন করত।

মানব সভ্যতার সূচনায় মানুষের অভাবের সংখ্যা ও পরিমাণ খুব কম ছিল। তাই মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস নিজেরাই তৈরি করত। ক্রমে লোকসংখ্যা যতই বাড়তে থাকে মানুষ ততই নিজস্ব প্রয়োজনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে দ্রব্য বিনিময় প্রথার সৃষ্টি হয়। এ প্রথার অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে অর্থের আবিষ্কার ও ব্যবহার হয়। মানুষ তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বিক্রি করে অর্থ জমা করতে লাগল। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিপত্তি – মানুষ ভুগতে লাগল নিরাপত্তাহীনতায়। উদ্বৃত্ত অর্থ নিজের কাছে রাখা নিরাপদ ছিল না বলে মানুষ সৎ, বিশ্বস্ত ও অবস্থাশালী আমানতদারের শরণাপন্ন হয়। এক্ষেত্রে এগিয়ে আসে স্বর্ণকাররা। তারা ব্যাংক হিসেবে কাজ করত এবং অর্থ, সোনা, রূপা, অলংকারাদি ইত্যাদি আমানত হিসেবে জমা রাখত। এভাবে ব্যাংকের প্রথম কাজ হিসেবে আমানত গ্রহণের সূত্রপাত হয়।

স্বর্ণকারগণ তাদের অভিজ্ঞতা হতে বুঝল যে, আমানতকারীগণ তাদের গচ্ছিত অর্থ একই সময় উত্তোলন করে না। তাই স্বর্ণকারেরা গচ্ছিত অর্থের একটা অংশ অন্যদেরকে সুদে ধার দিত। দেখা গেল যে, সুদের ব্যবসা হতে প্রচুর মুনাফা আসতে লাগল। ফলে আমানত বৃদ্ধি করার জন্য স্বর্ণকারেরা আমানতকারীদের কিছু সুদ দেওয়া আরম্ভ করল। স্বর্ণকারেরা আমানতকারীদেরকে যে হারে সুদ দিত তা অপেক্ষা বেশি সুদের হারে অন্যদেরকে ঋণ দিত। এভাবে সুদ দেয়া-নেয়ার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বর্ণকারদের মুনাফা এবং এ মুনাফা অর্জন পদ্ধতি ব্যাংকের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের সূত্রপাত ঘটায়।

ক্রমান্বয়ে আমানত এবং ঋণ ও মুনাফার পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাংক ব্যবসার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

অনুশীলন :

কেন মানুষ ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল?

ব্যাংক-এর প্রকারভেদ

প্রগতিশীল সমাজে অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের তাগিদে বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটে। অতীতে একই ব্যাংক মুদ্রা তৈরী, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আমানত গ্রহণ এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান ইত্যাদি কাজ করত। কিন্তু একই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভবপর নয়। এজন্য কাজের শ্রেণীভেদে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক। বর্তমানে অর্থনীতির প্রতিটি শাখার জন্য পৃথক পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

কার্যক্রমের ভিন্নতাভেদে প্রাথমিক দৃষ্টিতে ব্যাংক যে রকম হতে পারে, তা হল –

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
২. বাণিজ্যিক ব্যাংক
৩. শিল্প ব্যাংক
৪. কৃষি ব্যাংক
৫. সমবায় ব্যাংক
৬. বিনিময় ব্যাংক
৭. সঞ্চয় ব্যাংক
৮. বন্ধকী ব্যাংক
৯. ইসলামী ব্যাংক
১০. বিশ্ব ব্যাংক

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

অর্থ ও ঋণের বাজারকে সুষ্ঠু এবং বিধিগতভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি স্বাধীন দেশে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক রয়েছে। এটি ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষে অবস্থান করে তাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ – বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক', জাপানে 'ব্যাংক অব জাপান' যুক্তরাষ্ট্রে 'ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম', ভারতে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া', বৃটেনে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট প্রচলন ক্ষমতা রয়েছে। এটি সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাংকার। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অর্থের চাহিদা অনুযায়ী তার যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা, অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃর্মূল্য স্থিতিশীল রাখা, ঋণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পন্থা কার্যকর করা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী তদারক করা এবং সরকারের আর্থিক নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই মুনাফা অর্জন এর প্রধান লক্ষ্য নয়।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক

এ সকল ব্যাংক ব্যবসা বাণিজ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, তারা কিভাবে এ ঋণ প্রদান করে। জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে এ ব্যাংক তাদেরকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। উদাহরণ – বাংলাদেশে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদি।

অনুশীলনী :

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩. শিল্প ব্যাংক

এ ধরনের ব্যাংক বিভিন্ন আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। দেশের শিল্পায়নে এ ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন, পুরাতন কারখানা মেরামত ও সংস্কার সাধন, উৎপাদন কাজ অব্যাহত রাখা ইত্যাদিতে শিল্প ব্যাংক উদ্যোক্তাদের স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন যোগান দিয়ে থাকে। উদাহরণ – বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক'।

৪. কৃষি ব্যাংক

আমাদের মত কৃষি প্রধান দেশে এই ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই ব্যাংক কৃষকদের বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এটি কৃষকদের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। সাধারণতঃ বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদী, হালের গরু ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ক্রয়, পানি সেচ, কূপ খনন ইত্যাদির জন্য মধ্যম মেয়াদী এবং ট্রাকটর, গভীর নলকূপ স্থাপন, ভূমি সংস্কার ইত্যাদির জন্য কৃষি ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। উদাহরণ – বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক'।

৫. সমবায় ব্যাংক

আমরা জানি, সাধারণতঃ ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরা মুনাফা অর্জনের জন্য তাদের সঞ্চয় একত্রিত করে বিনিয়োগের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে। এ সকল সমবায়কে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা সমবায় ব্যাংকের কাজ। এ ব্যাংক দরিদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, বিভিন্ন যানবাহনের মালিক এবং সমবায় সমিতিগুলোকে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ দেয়। উদাহরণ – বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক।

৬. বিনিময় ব্যাংক

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনা-পাওনা পরিশোধ পদ্ধতিকে সহজতর করার জন্য বিনিময় ব্যাংক গঠিত হয়। এটি দেশীয় মুদ্রাকে বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকও অনেক সময় বিনিময় ব্যাংকের কাজ করে। উদাহরণ – বাংলাদেশে অবস্থিত স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক, গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক ইত্যাদি।

৭. সঞ্চয় ব্যাংক

আমি, আপনি–আমরা সবাইতো ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করি। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল সঞ্চয় ব্যাংক। এ ব্যাংকের প্রধান কাজ হল জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা। এটি সাধারণতঃ উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে জনসাধারণকে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে উৎসাহ প্রদান করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ধরনের সঞ্চয় ব্যাংক রয়েছে। বাংলাদেশে পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক মূলতঃ সঞ্চয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।

৮. বন্ধকী ব্যাংক

আপনার যদি জরুরী প্রয়োজনে টাকার দরকার হয় তবে আপনি কোথায় যাবেন? আত্মীয়-স্বজনের কাছে চাইলে হয়ত ধার পেতে পারেন – কিন্তু আপনার যদি আরও বেশি টাকার প্রয়োজন থাকে তবে এক্ষেত্রে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বন্ধকী ব্যাংক। আপনার যদি নিজস্ব জমি থেকে থাকে, তাহলে জমি বন্ধক রেখে আপনি দীর্ঘকালীন ঋণ পেতে পারেন। এ সকল ব্যাংক প্রধানতঃ কৃষিক্ষেত্রেই ঋণ প্রদান করে থাকে।

৯. ইসলামী ব্যাংক

সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কর্তৃক জেদ্দায় 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে ইসলামী ব্যাংক।

উদাহরণস্বরূপ – সুদানের 'ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক', বাহরাইনের 'বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক', জর্ডানের 'জর্ডান ইসলামী ব্যাংক' প্রভৃতি। আপনি যদি ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক অর্থ সঞ্চয় করতে চান, তবে এখানে তা পারবেন, কারণ এরা আপনার জমাকৃত অর্থের ওপর সুদ নয়, মুনাফা দেয়। বাংলাদেশেও ১৯৮৩ সালে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ' নামে দেশের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১০. বিশ্ব ব্যাংক

বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংক গঠিত। মূলতঃ বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এ ব্যাংকের মূলধন যোগান দিয়ে থাকে। এ ব্যাংক সদস্য দেশগুলোর পুনর্গঠন কাজে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যাংক কি? ব্যাংকের উৎপত্তি কিভাবে হল লিখুন।

২. ব্যাংক কত প্রকার ও কি কি? সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ব্যাংকের প্রথম কাজ কি ছিল?
   ক. আমানত গ্রহণ খ. ঋণদান
   গ. স্বর্ণমুদ্রা তৈরী ঘ. স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন

২. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি?
   ক. শিল্প ব্যাংক খ. সোনালী ব্যাংক
   গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. কৃষি ব্যাংক

৩. কোন ব্যাংক দেশে মুদ্রার প্রচলন করে?
   ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
   গ. শিল্প ব্যাংক ঘ. বিশ্ব ব্যাংক

৪. নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়?
   ক. ঋণদান করা খ. আমানত গ্রহণ করা
   গ. অর্থের যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি করা ঘ. মুদ্রার প্রচলন করা

সমস্যা

ধরুন, আপনারা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলেন, পড়ালেখা শেষ করে চাকরির খোঁজে না বেরিয়ে একটি আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করবেন। আপনাদের মেধা রয়েছে, রয়েছে এগিয়ে যাবার পথে দৃঢ় মনোবল। কিন্তু এমন গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও আপনাদের পথে যা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল মূলধন। নগদ অর্থের অভাবে হয়ত আপনাদের এত সুন্দর প্রচেষ্টা ব্যাহত হবার উপক্রম। এ ক্ষেত্রে আপনারা কোন্ ধরনের ব্যাংকের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন? কিভাবে ঋণ পেতে পারেন।

পাঠ - ৫ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমাদের জীবনের সাথে অর্থের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ দৈনন্দিন জীবন-যাপনে লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। এদিক থেকে আপনি নিশ্চয়ই সকলের সঙ্গে একমত হবেন যে, বর্তমান বিশ্বে প্রাত্যহিক জীবনে অর্থ ছাড়া পৃথিবী অচল। আর এই অর্থের লেনদেনে আমরা যে প্রতিষ্ঠানের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তার নাম ব্যাংক। সাধারণভাবে যে সকল ব্যাংকে আমরা যাতায়াত করি সেগুলো হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ সকল ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে আমরা সুদ/মুনাফা পাই। কাজেই মনে হয়, এ সকল ব্যাংক আমাদের অনেক উপকার করছে – তাই না! হ্যাঁ, এ সকল ব্যাংক নানা দিক দিয়ে আমাদের উপকার করছে ঠিকই, কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন, এ সকল ব্যাংক যেন আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে পারে, সেজন্য এদের কার্যকলাপের উপর যে প্রতিষ্ঠানটি সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখছে, তার নাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নানাভাবে এ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের সহায়তা করছে। কিভাবে বিনিয়োগ করলে আপনি বেশি সুবিধা পাবেন – এ সম্পর্কে উপদেশ দেয়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমাকৃত আপনার অর্থের যেন সদ্ব্যবহার হয়, তার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে এ ব্যাংক। সে অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য সকল ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়। জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণই এ ব্যাংকের প্রধান কাজ। দেশের ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাণ এবং গতি সঞ্চার করে থাকে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাদি পর্যালোচনার আগে আসুন সংক্ষেপে জেনে নিই এর ইতিহাস।

কবে থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

মজার ব্যাপার কি জানেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্ভবের অনেক পরে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্রপাত ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। ১৬৬৮ সালে সুইডেনের Riks Bank প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গোড়াপত্তন হয়। এটি বিশ্বের সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে পরিচিত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বয়স যদিও তিন শতাব্দীরও বেশি, এর সত্যিকার কার্যক্রম এবং বিকাশ সাধিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

উদাহরণস্বরূপ, Bank of England প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৯৪ সালে কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে এর প্রকৃত কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৪৪ সালে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম দিকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সূচনা হয় মূলতঃ একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৮২ সালে Bank of Japan প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের মুদ্রাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে Bank of England-এর প্রতিষ্ঠা পাওয়া ছিল একটি দৈব ঘটনা। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ চেকের সাহায্যে তাদের ব্যালান্স মীমাংসা (clearing the balances) করার জন্য Bank of England-কে সুবিধাজনক মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়ার পর থেকেই এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। আধুনিককালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র কোন

বিশেষ কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীকে তাই কতগুলো সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। এ পাঠে আমরা সংক্ষেপে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা ও প্রধান কার্যাবলী সম্পর্কে জানব।

অনুশীলনী :

বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরে মানুষ কেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল?

এক কথায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করলে এর সম্পর্কে একটি সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা যাবে। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য।

চধঁষ অ. ঝধসঁবষংড়হ ও ডরষষরধস উ. ঘড়ৎফযধঁং প্রদত্ত নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে আমরা একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারব :

কেন্দ্রীয় ব্যাংক "সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এমন একটি সংস্থা যা একটি দেশের অর্থের যোগান ও ঋণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে পরিচালনা করে থাকে। ("A government established agency responsible for controlling the nation's money supply and credit conditions and for supervising the financial system, especially commercial banks")।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলতঃ আর্থিক ব্যাপারে সরকারের প্রতিনিধি। এটি একটি সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়তা করে জনসাধারণ ও সমগ্র দেশের মঙ্গল সাধন করে।

নিম্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর পরিধি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

১. নোট প্রচলন করা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে নোট প্রচলন করা। কাগজী ও ধাতব মুদ্রা ছাপানোর অধিকার শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরই আছে। সে কারণেই, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণভাবে নোট প্রচলনের ব্যাংক হিসেবে পরিচিত ছিল। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এককভাবে দেওয়া হল কেন। এর উত্তরে বলা যায়, ইস্যুকৃত নোটের সমজাতীয়তা রক্ষা করা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টি এ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২. সরকারের ব্যাংকার

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। সরকারের সকল আয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের সকল স্তর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করে। এছাড়া, সরকারী ঋণের পরিচালনা করা, সরকারকে প্রয়োজনমত স্বল্পকালীন ঋণ দেয়া, সরকারকে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয়া এবং আর্থিক ব্যাপারে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া আর্থিক নীতিসমূহ বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের উত্তম পরামর্শক হিসেবে কাজ করে।

৩. ব্যাংকসমূহের ব্যাংকার

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য ব্যাংক তাদের নগদ আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন অন্যান্য ব্যাংক এ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখে। এর উত্তরে বলতে হয়, এ জমা রাখার ফলে ব্যাংকগুলি প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ পায়। কোন কোন দেশে, যেমন – ইংল্যান্ডে, এটি প্রথা হিসেবে প্রচলিত। আবার, কোন কোন দেশে এটি আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে তফসিলভুক্ত ব্যাংকগুলিকে আইনতঃ এদের মোট আমানতের শতকরা ৫ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকসমূহের প্রদেয় ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। যদি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করে তাহলে মোট অর্থের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং তার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। আবার যদি ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তাহলে মুদ্রা সংকোচন দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে দেশের উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ইত্যাদি কমে যাবে। সুতরাং কখন, কি পরিমাণ ঋণ প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এখন প্রশ্ন জাগে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে এই ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে, ব্যাংক-হার পরিবর্তন, খোলা বাজারী কারবার, নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন – অনুরোধ বা নির্দেশ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলির ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অনুশীলনী :

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে একটি দেশের অর্থনীতিতে অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, আলোচনা করুন।

৫. ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের সর্বশেষ স্তরের ঋণদাতা হিসেবে কাজ করে। সাধারণতঃ ব্যাংকগুলি আমানতকারীদের অর্থ নিয়ে কাজ করে। আমানতকারী দাবী করলে ব্যাংক তাদের অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। এজন্য ব্যাংক সব সময় কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে জনগণ তাদের আমানতের একটি বড় অংশ উঠিয়ে নিতে পারে (দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা, যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত, শেয়ার বাজারের সূচকের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিস্থিতিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে)। এই অবস্থায় ব্যাংক বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হয়। এই প্রকার সাময়িক অর্থ সংকট কাটানোর জন্য ব্যাংক যখন অন্য কোন উৎস হতে ঋণ পায় না, তখন একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক একে ঋণদান করে থাকে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

৬. বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা

মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ। দেশের মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিরতা না থাকলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এজন্য বর্তমানে প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক-বিনিময় হার ধার্য্য করে দেয় এবং এই হার যাতে অযথা পরিবর্তিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখে।

৭. ক্লিয়ারিং হাউজ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে কাজ করে। ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে থাকে।

৮. অন্যান্য

উপরোক্ত সাধারণ কাজগুলো ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ কতগুলো কাজ সমাধা করে থাকে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয়তঃ ঋণ কাঠামো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রার অভ্যন্তরীণ মূল্য অপরিবর্তিত রাখে। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের জন্য শিল্প ঋণ সংস্থা এবং কৃষি ঋণ সংস্থার মত প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে এবং ক্ষেত্রভেদে সরাসরি ঋণ প্রদান করে থাকে। শেষোক্ত বিষয়টি বাংলাদেশের মত উন্নয়শীল দেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা লিখুন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাস বর্ণনা করুন।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলীসমূহ আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. কোন ব্যাংককে সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক বলা হয়?
   ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কৃষি ব্যাংক
   গ. শিল্প ব্যাংক ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
২. বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি?
   ক. Risk Bank খ. Federal Reserve Bank
   গ. Bangladesh Bank ঘ. World Bank
৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ কি?
   ক. মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা খ. ক্লিয়ারিং হাউজ
   গ. নোট প্রচলন করা ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
৪. কোন ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে?
   ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
   গ. সমবায় ব্যাংক ঘ. বিশ্ব ব্যাংক
৫. বাংলাদেশের তফসিলভুক্ত ব্যাংকগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আমানতের শতকরা হার কত?
   ক. ৫% খ. ১০%
   গ. ৭% ঘ. ৯%

সমস্যা

ধরুন, আপনাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ করা হল। এমতাবস্থায় বর্তমানে প্রচলিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যধারাগুলোকে কি আপনি পর্যাপ্ত মনে করেন? যদি না করেন তাহলে এক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের সংযোজন বা বিয়োজন বা উভয়ই ঘটাবেন? আর যদি বর্তমান কার্যধারাকে পর্যাপ্ত মনে করেন তবে এর আলোকে কিভাবে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবেন? বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে চিন্তা করুন।

পাঠ - ৬ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী সম্বন্ধে বলতে পারবেন
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন

'বাণিজ্যিক ব্যাংক' শব্দটি পড়েই আপনি নিশ্চয়ই একটি প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে শব্দটি শুনলে মনে হয় – যে ব্যাংক বাণিজ্য করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। আসলেই কিন্তু তাই। মূলতঃ বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংককেই বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

সংজ্ঞাটি এভাবে দেয়া যায় – যে ব্যাংক জনসাধারণের নিকট হতে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক কম সুদে ব্যবসায়ী ও অন্যান্যদের ঋণ প্রদান করে। সুদ দেয়া ও সুদ নেয়া এ দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তাই ব্যাংকের মুনাফা।

আসুন এবার বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী জেনে নেয়া যাক।

আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর কার্যাবলীকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী
খ. জনহিতকর কার্যাবলী
গ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী

নিচে এগুলো আলোচনা করা হল।

ক. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর প্রাথমিক ও মৌলিক কার্যাবলীকে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী বলে। নিম্নের আলোচনা থেকে আমরা এ সম্বন্ধে একটি ধারণা পেতে পারি।

১. আমানত গ্রহণ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে জনসাধারণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে সাধারণতঃ তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে। যথা –

i. চলতি আমানত
ii. স্থায়ী আমানত
iii. সঞ্চয়ী আমানত

যে আমানত হতে আমানতকারী ইচ্ছামত যে কোন সময় টাকা তুলতে পারে তাকে চলতি আমানত বলা হয়। চলতি আমানতের উপর সাধারণতঃ কোন সুদ দেয়া হয়না। যে আমানত হতে আমানতকারী একটি নির্দিষ্ট সময় পর টাকা তুলতে পারে তাকে স্থায়ী আমানত বলা হয়। এক্ষেত্রে আমানতকারী আমানত রাখার তারিখ হতে নির্দিষ্ট সময় পরে (যেমন ৬ মাস) যথোপযুক্ত নোটিশ দিয়ে টাকা তুলতে পারে। কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদ শেষ হবার পর টাকা তোলা যায় বলে একে মেয়াদী আমানতও বলা হয়।

সঞ্চয়ী আমানত হতে সপ্তাহে একবার বা দু'বার টাকা তোলা যায় এবং এর সুদ মেয়াদী আমানত অপেক্ষা কম। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত অধিকাংশ লোকই এরূপ আমানত করে থাকে।

২. ঋণদান

ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হল ঋণ দান করা। লোকে যে অর্থ ব্যাংকের আমানত হিসেবে জমা রাখে তার সবটাই ব্যাংক কখনও নগদ অর্থ হিসেবে হাতে রাখে না। ব্যাংক মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ হাতে রেখে অপর অংশ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতি শ্রেণীর লোককে ধার দেয় এবং তাদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে। এভাবে তারা মুনাফা অর্জন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করে। ব্যাংক সাধারণতঃ তিন প্রকারে টাকা দেয়। প্রথমত, জিনিসপত্র বা অন্য কোন মূল্যবান দ্রব্য বন্ধক রেখে সরাসরি নগদ টাকা ধার দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমানতকারীর আমানতের অতিরিক্ত পরিমাণ অগ্রিম দিতে পারে। তৃতীয়ত, হুন্ডি বা প্রতিশ্রুতি পত্রের বিনিময়ে টাকা ধার দিতে পারে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক শিল্প ও ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে ঋণদান করে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৩. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা

বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে কাজ করে। ব্যাংক চেক বিহিত মুদ্রার মতই লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ লেনদেনই চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

৪. ঋণ আমানত সৃষ্টি

বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদানের মাধ্যমে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করতে পারে। যারা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে তারা অনেক সময় ঋণের টাকা নগদ না উঠিয়ে ব্যাংকের একাউন্টে জমা রাখে। পরে প্রয়োজনবোধে ঋণ গ্রহীতা চেকের মাধ্যমে সে টাকা উঠাতে পারে। এক্ষেত্রে ঋণ হতেই আমানত সৃষ্টি করে।

৫. ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা

মুদ্রাবাজারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহায়তা করে।

অনুশীলনী :

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী আলোচনা করুন।

খ. জনহিতকর কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্য করলেও এর পাশাপাশি কিছু জনহিতকর কাজ করে। যেমন –

৬. হুন্ডি বাট্টা করা

বাণিজ্যিক ব্যাংকের আরও একটি প্রধান কাজ হচ্ছে হুন্ডি বাট্টা করা। হুন্ডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই যদি অর্থের প্রয়োজন হয় তবে হুন্ডির মালিক তা ব্যাংকে ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা পেতে পারে। তবে হুন্ডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়ের সুদ অগ্রিম কেটে বাকী টাকা হুন্ডির মালিককে দেয়া হয়। একে হুন্ডির বাট্টাকরণ বলে।

৭. অর্থ প্রেরণ

বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ পদ্ধতিতে মক্কেলের অর্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রেরণের সুযোগ করে দেয়। ব্যাংকের দেয়া চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ভ্রমণকারী চেক প্রভৃতির মাধ্যমে মক্কেলগণ বিভিন্ন স্থানের পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করতে পারে।

৮. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা

বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে। হুন্ডি বাট্টা করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এভাবে বাণিজ্যে গতি সঞ্চারিত হয়।

৯. মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ

বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের মূল্যবান দলিল, অলংকার, গয়না ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করে। এর বিনিময়ে ব্যাংক মক্কেলদের কাছ থেকে কিছু অর্থ গ্রহণ করে ঠিকই, কিন্তু এতে মক্কেলগণই বেশি লাভবান হন।

গ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে।

১০. মক্কেলদের পক্ষ হয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ঋণপত্র এবং নিরাপত্তা ক্রয়-বিক্রয় করে।
১১. বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের বাড়ী ভাড়া, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, আয়কর, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি পরিশোধ করে থাকে।
১২. অছি (Trustee) হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের সম্পত্তি দেখাশোনা করে।
১৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের জন্য টিকিট, পাসপোর্ট ইত্যাদি সংগ্রহ করে।
১৪. মক্কেলদেরকে প্রয়োজনবোধে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, দেশের বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিন।
২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ কি?
ক. ঋণদান করা খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা
গ. মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা ঘ. আমনত গ্রহণ করা

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের নিকট থেকে কয় ধরনের আমানত গ্রহণ করে?
ক. তিন খ. চার
গ. পাঁচ ঘ. ছয়

৪. নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত?
ক. হুন্ডি বাট্টা করা
খ. অর্থ প্রেরণ করা
গ. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা
ঘ. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা

৫. নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের জনহিতকর কাজ নয়?
ক. আমানত গ্রহণ খ. ঋণ দান
গ. অর্থ প্রেরণ ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা

সমস্যা

ধরুন, আপনি বিদেশ থেকে আপনার ভাইকে অর্থ পাঠাচ্ছেন, কারণ সে একটি ব্যবসা শুরু করতে চায়। এ ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে বিদেশ থেকে টাকা পাঠাবেন? আর ব্যবসা শুরুর জন্য আপনার পাঠানো অর্থ পর্যাপ্ত না হলে আপনার ভাই বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কি ধরনের সাহায্য পেতে পারেন?

পাঠ - ৭ : বীমা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বীমা কি তা বলতে পারবেন।
- বীমা কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বীমার কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- বীমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বীমা কি ?

প্রতিটি ব্যবসায়ের সাথেই ঝুঁকি জড়িত। আর ঝুঁকি সম্পূর্ণভাবে একটি আপেক্ষিক বিষয়। এটা হতে পারে লোকসানের ঝুঁকি অথবা সম্পত্তি, গাড়ি, আগুন বন্যা, দুর্ঘটনা এমনকি চুরিজনিত ঝুঁকি। এখন এরকম ঝুঁকির ক্ষেত্রে অন্য কাউকে দোষারোপ করাও যায় না। আবার ক্ষতিপূরণও করা যায় না। ব্যবসায়ের এ জাতীয় ঝুঁকি বহনের এই অসুবিধার দরুনই বীমা প্রতিষ্ঠান মানুষের সকল ঝুঁকির বীমা করে থাকে।

তাহলে বীমা হচ্ছে এমন একটি দলিল যাতে বীমাকৃত সম্পত্তির বা দ্রব্যের বা ব্যক্তির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এবং যার বিপরীতে বীমা হচ্ছে তার পূর্ণ বিবরণ দেয়া থাকে।

এখন কথা হচ্ছে, সব ঝুঁকির তো আর বীমা করা সম্ভব নয়। যেমন ধরুন যুদ্ধের কথা। যুদ্ধ হলে ক্ষতি হবেই। এই জাতীয় ঝুঁকির বীমা করা সম্ভব নয়। তাহলে দু'রকমের ঝুঁকি পাওয়া যাচ্ছে –

ক. নিশ্চিত ঝুঁকি ও
খ. অনিশ্চিত ঝুঁকি

নিশ্চিত ঝুঁকি হচ্ছে যে সব দ্রব্যের ঝুঁকি বীমা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পূরণ করা যায়। যে সমস্ত দ্রব্যের পরিবর্তন গাণিতিকভাবে গণনা করা যায় এবং কোন ক্ষতি হলে তার মূল্য নির্ধারণ করা যায় তা-ই নিশ্চিত ঝুঁকি। এই ঝুঁকির মূল্য নির্ধারণই হচ্ছে বীমার কিস্তির ভিত্তি। বীমা প্রতিষ্ঠান এই জাতীয় ঝুঁকি বহন করে কারণ –

ক. ঝুঁকি বহনকারী বহুলোক তাদের ঝুঁকি দূর করার জন্য বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হয়।
খ. শুধু অল্পসংখ্যকই ক্ষতির স্বীকার হয়।
গ. দীর্ঘমেয়াদে বীমার দাবী ঐ সময়ে এদের কিস্তির চেয়ে কম হয়।

উদাহরণস্বরূপ আগুন, গাড়ী দুর্ঘটনা প্রভৃতির কথা বলা যায়।

আবার কিছু কিছু ঝুঁকি অনিশ্চিত, কারণ এই জাতীয় ঝুঁকির ক্ষতির পরিমাণ গণনা করা যায় না। তাই বীমার কিস্তির পরিমাণও নির্ণয় করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বন্যা, ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবসায়ের ক্ষতি, দামের ঝুঁকি, মানুষের রুচি বা স্বাদের পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রভৃতির কথা বলা যায়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে, এত ঝুঁকি বহন করে বীমা প্রতিষ্ঠান কিভাবে মুনাফা তৈরি করে?

বীমা প্রতিষ্ঠান জনগণের একটি অপরিহার্য সেবা প্রদান করে। এর মাধ্যমেই তারা তাদের ব্যবসা করে। বিনিময়ে তারা তাদের অংশীদারের মুনাফা বৃদ্ধি করার প্রত্যাশা করে। বীমা প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহকদের কাছে বীমা-বিক্রি করে বীমার কিস্তি পায়। বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস করার জন্য একই রকম মানসম্পন্ন শুল্ক, কিস্তির

হার, মানসম্পন্ন নীতি গ্রহণ করে। যেমন – অগ্নিবীমা। অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রচুর তরল অর্থের সংস্থান করা যায়, যার দ্বারা গ্রাহকের দাবী মিটানো হয়। বাকী টাকা দক্ষভাবে অন্য ব্যবসায় খাটিয়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা যায়।

আর এভাবেই বীমা প্রতিষ্ঠান তাদের কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করে থাকে।

উচ্চ বীমা ও নিু বীমা (Over Insurance and Under Insurance) :

একজন লোক যদি তার সম্পত্তির জন্য ১২,০০০ টাকার বীমা করে এবং যদি তার সম্পত্তির মূল্য হয় ১০,০০০ টাকা তবে তা হবে উচ্চসীমা। এই জাতীয় বীমা গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক নয়। কারণ –

১. তাকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কিস্তি প্রদান করতে হয়।
২. যদি তারা সম্পত্তি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় তবে সেই কখনই ১২,০০০ টাকা পাবে না। সে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে কারণ বীমা হচ্ছে নিরাপত্তার চুক্তি।
৩. সে তার জ্ঞানমতে তার সম্পত্তির মূল্যের অতিরিক্ত স্ফিতি ঘটাবে না। কারণ বীমা হচ্ছে সর্বাধিক নির্ভরতার চুক্তি।

আবার যদি একজন লোক তার সম্পত্তির ৮,০০০ টাকার বীমা করে এবং যদি তার সম্পত্তির মূল্য ১০,০০০ টাকা হয় তবে তা নিম্ন বীমা। এ জাতীয় ব্যক্তি তার বীমাকৃত কিস্তি হতে সঞ্চয়ের প্রত্যাশা করে কারণ সে কম কিস্তি প্রদান করছে। এখন কথা হচ্ছে নিম্ন বীমা থেকেও সে কোন সুবিধা পায় না। কারণ –

১. তার সম্পত্তি পুরোপুরি আওতাভুক্ত নয়। যদি সম্পত্তি পুরোপুরি নষ্ট হয় তবে সে সর্বোচ্চ ৮,০০০ টাকা পেতে পারে। কারণ তার কিস্তি পরিমাণ হচ্ছে শুধু ৮,০০০ টাকা। যদি তার সম্পত্তির অর্ধেক নষ্ট হয় তবে সে $\frac{১}{২}\times ৮,০০০ = ৪,০০০$ টাকা ক্ষতিপূরণ পায়। এক্ষেত্রে তার সম্পত্তির প্রতিস্থাপন মূল্য ৫,০০০ টাকা। এর কারণ বীমা হচ্ছে নিরাপত্তার চুক্তি।
২. সে তার জ্ঞানমতে তার সম্পত্তির মূল্যের সংকোচন ঘটাবে না। কারণ বীমা সর্বাধিক নির্ভরতার চুক্তি।

তাহলে দাড়ায় যে, বীমাকৃত সম্পত্তির মূল্য বীমার কিস্তির চেয়ে কম হলে তা উচ্চ বীমা এবং সম্পত্তির মূল্য বীমার কিস্তির চেয়ে বেশি হলে তা নিম্ন বীমা বলে।

বীমার প্রকারভেদ :

এখন আসুন আমরা বীমার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করি। বীমা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন –

নৌ-বীমা

এ জাতীয় বীমা জাহাজ এবং দ্রব্যাদির সমুদ্রের ভয়ানক বিপদের জন্য হয়ে থাকে। এই ভয়ানক বিপদসমূহের মধ্যে আগুন, চুরি, দস্যুবৃত্তি, ভার কমানোর জন্য পানিতে ফেলে দেয়া দ্রব্যাদি, বাজেয়াপ্তকরণ, আটকাবস্থা, খারাপ আবহাওয়া, নিমজ্জিত হওয়া এবং সংঘর্ষ ইত্যাদি। চার রকম নৌ-বীমা রয়েছে। যেমন –

ক. **জাহাজের কাঠামো ও যন্ত্রপাতি :** এই জাতীয় নৌ-বীমা জাহাজের ক্ষতির জন্য উপকারী। এটা ১২ মাসের জন্য সময়-বীমা হতে পারে। আবার স্থানান্তর-বীমাও হতে

পারে। অর্থাৎ স্থানান্তর বীমা যাত্রার বন্দর থেকে শুরু করে পৌঁছানোর বন্দর পর্যন্ত কার্যকরী।

খ. **জাহাজের ক্ষয়ক্ষতি :** এ জাতীয় বীমায় জাহাজের মালিক তার জাহাজে বহনকৃত দ্রব্যাদি নষ্ট হওয়ার জন্য দাবী করতে পারে। এ জাতীয় বীমার ক্ষেত্রে দ্রব্যের মালিক দ্রব্য নষ্ট হবার জন্য যে ক্ষতিপূরণ পায় তার একটা অংশ আমদানীকারককে প্রদান করে। কারণ আমদানীকারক দ্রব্যাদি না পেলেও তার কিছু ব্যবস্থাপনা খরচ হয়। এই খরচ মিটানো এবং ব্যবসায়ের সুখ্যাতি বজায় রাখার জন্য এ জাতীয় ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। এটা যদি F.O.B (Free on Board) চুক্তি হয় তবে রপ্তানীকারক বহনকারী জাহাজে মালামাল তুলে দেয়ার খরচ বহন করে। আবার এটা যদি C.I.F (Cost, Insurance, Freight) অর্থাৎ দাম, বীমা ও পরিবহন মাশুল-চুক্তি হয় তাহলে রপ্তানীকারক দ্রব্যটি উহার গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার দেয়ার সকল দায়িত্ব বহন করে।

গ. **মালামাল :** জাহাজের মালিক সাধারণতঃ মালামালের বহনের খরচ অগ্রিম আদায় করে। জাহাজ হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তাকে বহনের খরচ ফেরত দিতে হয়। এই জাতীয় দায়বদ্ধতার জন্য তাকে বীমা করতে হয়।

ঘ. **জাহাজে মালিকদের দায়বদ্ধতা :** জাহাজের মালিক জাহাজ, যাত্রী, নাবিক, ক্রু অন্যান্য বাহন, জাহাজের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষতি, তেল নিঃসরণ ইত্যাদির জন্য বীমা এই পর্যায়ের আওতাভুক্ত। নৌ-বীমার প্রধান বাজার হল Joyper Loyads।

অগ্নিবীমা :

কোন ঘর-বাড়ী, দালান, অফিস আদালত প্রভৃতি স্থানে আগুন লাগলে যে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তার বিপরীতে যে বীমা করা হয় তা অগ্নিবীমা। এই জাতীয় বীমার আরও সম্প্রসারিত কয়েকটি দিক রয়েছে। অগ্নিবীমা সিঁদ কেটে চুরি, বাড়ির ধ্বস, চুরি, গৃহপরিচারক বা পরিচারিকার দুর্ঘটনা, তৃতীয় পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতা, কাঁচ ভাঙ্গা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে।

দালানের অবস্থা, স্থায়িত্ব, দহন ক্ষমতা, অগ্নি-নিরোধক ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর কিস্তির পরিমাণ নির্ভর করে। সাধারণতঃ অগ্নিবীমা প্রভাবজনিত লোকসানেরও বীমা অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এটা হল আগুনের জন্য দালান বা যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার জন্য মুনাফার যে লোকসান হয়। সম্প্রসারিত অগ্নিবীমা বয়লার ও যন্ত্রপাতির বীমাকে অন্তর্ভুক্ত করে। বন্যা নীতিও অগ্নিবীমার একটি সম্প্রসারিত কার্যক্রম।

জীবন বীমা :

এই জাতীয় বীমা কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর বা বীমার পলিসির পূর্ণতা সম্পন্ন হওয়ার পর দেয়া হয়। এর দুটি প্রধান শাখা হল –

সাধারণ : এটা শুধু পলিসির মালিক বা তার উত্তরাধিকারদের নিয়ে পর্যালোচনা করে।
শিল্পজনিত : এই জাতীয় বীমা কম উপার্জনকারীদের নিয়ে পর্যালোচনা করে।

জীবন বীমার বিভিন্ন ধরন :

পূর্ণ-জীবন পলিসি : এই জাতীয় পলিসিতে কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে অথবা নির্দিষ্ট কোন বয়সের শেষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে পায়। কিস্তির পরিমাণ Endowment পলিসির চেয়ে কম হয় কারণ এটা দীর্ঘ সময় ধরে দেয়া হয়।

Endowment পলিসি : পলিসির পূর্ণতা অথবা মৃত্যু যেটি আগে ঘটে তার জন্য যে বীমা করা হয় তা Endowment পলিসি। এটা মুনাফা যুক্ত বা মুনাফাবিহীন হতে পারে।

পারিবারিক আয় পলিসি : কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার স্ত্রী বা নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ এই পলিসির অর্থ পায়। এই পলিসির অর্থ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়।

বন্ধক নিরাপত্তা পলিসি : কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার বন্ধককৃত সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য এই বীমা করা হয়। ব্যক্তির মৃত্যুর পর বীমা প্রতিষ্ঠান অপ্রদেয় অর্থ প্রদান করে থাকে।

সমষ্টিগত জীবন-বীমা পলিসি : এক জাতীয় কয়েকজন চাকুরীজীবি মিলে এটা করে। এই জাতীয় পলিসিকে পেনশন বীমাও বলা হয়। পেনসন বীমা একটি সমবায় সমিতির মাধ্যমে করা যায়।

দুর্ঘটনাজনিত বীমা : বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকির জন্য যে বীমা করা হয় তাই দুর্ঘটনাজনিত বীমা। এই জাতীয় বীমার প্রকারভেদ হল –

ক. দায়বদ্ধতা বীমা :

১. কর্মচারীদের অবহেলার দরুন কাজের সময় তাদের কোন দুর্ঘটনার দায়বদ্ধতা।

২. পেশাজীবিদের নিরাপত্তা। আইনবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট ইত্যাদি পেশা পেশাজীবিদের অবহেলা ও ত্রুটি ইত্যাদির বিপরীতে বীমা।

৩. **সমষ্টিগত দায়বদ্ধতা :** যদি কখনও তৃতীয় পক্ষের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ ক্ষতি যদি বীমাকারীর দ্বারা অথবা তার কোন কর্মচারী দ্বারা সংগঠিত হলে এই জাতীয় বীমা কার্যকর হয়।

৪. **ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা :** কোন ব্যক্তির নিজের বা তার প্রতিষ্ঠান বা তার কোন কর্মচারী দ্বারা অন্য কারোর বা তার প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষয়ক্ষতি সংগঠিত হলে তা এই জাতীয় বীমার আওতায় পড়ে।

খ. সম্পত্তি বীমা : এই জাতীয় বীমার আওতায় একটি প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য বীমা করা হয়ে থাকে।

গ. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা : কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারী আহত বা মৃত্যুর সম্মুখীন হলে এই জাতীয় বীমার দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

ঘ. মহিলা কল্যাণ বীমা : যদি কোন প্রতিষ্ঠানে মহিলা শ্রমিক সংখ্যা ৫ জনের কম হয় এবং তাদের বেতন ১০০০ ডলারের কম হয় তবে তাদেরকে এই বীমার আওতায় ফেলা হয়। এই বীমা সাধারণত মালয়েশিয়ায় কার্যকরী।

ঙ. টাকার ক্ষতিজনিত বীমা : হস্তান্তরের সময় টাকা হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে এই বীমা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করা যায়।

চ. সুদ বীমা : ব্যাংকে বা অন্য যে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা যে কারো শঠতা বা প্রতারণা থেকে নিরাপত্তার জন্য এই জাতীয় বীমা করা হয়।

ছ. অসুস্থতা বীমা : একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী বা তাদের পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতার জন্য আর্থিক বরাদ্দের জন্য এ জাতীয় বীমা করা যায়।

বাহন বীমা :

বাহন বীমা গাড়ির দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি, অপর পক্ষের সম্পদের ক্ষতি, নিজের সম্পদের ক্ষতি, গাড়ি চুরি বা গাড়িতে আগুন লাগা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বীমা করে থাকে। গাড়ি আরোহীদের সম্পদের নিরাপত্তা ও তাদের দুর্ঘটনাজনিত অসুস্থতা ইত্যাদি এর আওতায়। বিশ্বের প্রায় অনেক দেশেই গাড়ি সার্বিক বীমা অথবা তৃতীয় পক্ষ বীমা নিশ্চিত।

বিমান বীমা :

এ জাতীয় বীমা আকাশ পথে বিমান, হেলিকপ্টার প্রভৃতি আকাশযানের ক্ষয়ক্ষতির নিরাপত্তার জন্য বীমা করে থাকে। এই জাতীয় বীমা যাত্রীদের দুর্ঘটনা, তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি, সম্পত্তি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করে। বিমানের কর্মীরাও সমষ্টিগতভাবে এ বীমার আওতায়।

নিউক্লিয়ার বীমা :

এ জাতীয় বীমা বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশে প্রচলিত। এ জাতীয় বীমার আওতায় নিউক্লিয়ার যে কোন বিস্ফোরণের জন্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের জীবন, তৃতীয় পক্ষের ক্ষতি প্রভৃতি। নিউক্লিয়ার বীমা পুলস-এর আওতাধীন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো এ জাতীয় বীমা পরিচালনা করে।

বীমা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব :

এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন প্রকারের বীমা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আসা যাক্ এর গুরুত্ব কি –

১. আমাদের জীবনের বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনার নিরাপত্তা বিধান করছে বীমা প্রতিষ্ঠান। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারদের একটা নির্দিষ্ট অর্থের নিশ্চয়তা বীমা প্রদান করছে।

২. এ ছাড়া সাধারণ বীমাসমূহ আমাদের বিভিন্নরকম ব্যবসায় উৎসাহিত করছে এবং এতে করে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, জাতীয় আয় বাড়ছে, দেশের উন্নতি হচ্ছে।

৩. নৌ বা বিমান বীমা দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আরও ত্বরান্বিত করছে। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে ও দেশের সার্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে।

৪. বীমা প্রতিষ্ঠান অল্প কিস্তি (Premium) নিয়ে অনেক বেশি মুনাফা দিচ্ছে।

৫. এর দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি নিরাপদ ও রক্ষণশীল।

সুতরাং দেশের সার্বিক উন্নয়নে বীমা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনী ১ :

নীচের অগ্নিবীমাগুলোর মধ্যে কোনটি কোন প্রকার বীমা লিখুন।

গাড়ীতে আগুন লাগা,
বাড়ীতে আগুন লাগা,
শরীরে আগুন লাগা,
জাহাজে আগুন লাগা,
বিমানে আগুন লাগা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বীমার সংজ্ঞা লিখুন। উচ্চ বীমা ও নিম্ন বীমা কি লিখুন।
২. বীমার প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৩. বীমার গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নিশ্চিত ঝুঁকিতে কোন ক্ষতির মূল্য –
ক. সম্পূর্ণ নির্ধারণ করা যায় খ. সম্পূর্ণ মোটেই নির্ধারণ করা যায় না
গ. আংশিক নির্ধারণ করা যায় ঘ. বেশির ভাগ নির্ধারণ করা যায়

২. উচ্চ বীমাতে গ্রাহককে সম্পত্তির মূল্যের তুলনায় –
ক. কম কিস্তি প্রদান করতে হয় খ. সমান কিস্তি প্রদান করতে হয়
গ. বেশি কিস্তি প্রদান করহেত হয় ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়

৩. নৌ-বীমা কত প্রকার?
ক. তিন প্রকার খ. চার প্রকার
গ. পাঁচ প্রকার ঘ. ছয় প্রকার

৪. নিম্নের কোনটি জীবন বীমার অন্তর্ভুক্ত?
ক. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা খ. সম্পত্তি বীমা
গ. অসুস্থতা বীমা ঘ. Endowment পলিসি।

সমস্যা ৮ :
"বীমা মানুষের সকল প্রকার ঝুঁকির নিয়ন্ত্রক।" কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

পাঠ ২ : ১. খ ; ২. ক ; ৩. খ ; ৪. ক ; ৫. খ

পাঠ ৩ : ১. ঘ ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ক ; ৫. ক

পাঠ ৪ : ১. ক ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ঘ

পাঠ ৫ : ১. ঘ ; ২. ক ; ৩. গ ; ৪. খ ; ৫. ক

পাঠ ৬ : ১. খ ; ২. ঘ ; ৩. ক ; ৪. গ ; ৫. গ

পাঠ ৭ : ১. ক ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ঘ